ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-VI, July, 2026, Page No. 2173-2184
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.06W.480

জৈন দর্শনে আগম প্রমাণ: একটি পর্যালোচনা

ড. রাসপতি মণ্ডল, *সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, বঙ্গবাসী কলেজ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 12.06.2026; Accepted: 10.07.2026; Available online: 31.07.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In Jain philosophy, Āgama Pramāṇa (scriptural testimony) is an important category of indirect knowledge (parokṣa pramāṇa), through which valid cognition is obtained from the trustworthy and non-contradictory teachings of an Āpta (authoritative person). Since the Tīrthaṅkaras are free from attachment and aversion (vītarāga), omniscient, and benevolent teachers, their discourses and scriptures are accepted as authentic sources of knowledge. Jain epistemology analyzes the process of meaning-cognition through words, terms, and sentences, demonstrating that the statements of an Āpta provide reliable knowledge concerning the nature of soul (jīva), non-soul (ajīva), karma, and liberation (mokṣa). Furthermore, through the doctrines of Anekāntavāda and Syādvāda, the theory of Saptabhaṅgī explains the multifaceted nature of reality and reveals the limitations of one-sided philosophical viewpoints. Jain philosophers maintain that no object can be adequately understood solely in terms of existence or non-existence; rather, its nature must be determined from various relative standpoints. The concepts of Sakalādeśa and Vikalādeśa are employed to explain the methods of attaining comprehensive and partial knowledge of an object. Ultimately, Jain philosophy accepts an Anekāntic reality constituted by the synthesis of universality and particularity, substance and modes, permanence and change as the proper object of valid knowledge.

Keywords: Āgama Pramāṇa, Āpta, Anekāntavāda, Syādvāda, Saptabhaṅgī, Sakalādeśa, Vikalādeśa

জৈন দর্শনে আগম প্রমাণকে পরোক্ষ প্রমাণের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। পরোক্ষ প্রমাণের স্মরণাদি চারটি ভেদের আলোচনা শেষে আগম প্রমাণের প্রতিপাদন করতে গিয়ে বলা হয়েছে — “आप्तवाक्यजन्यमर्थज्ञानमागम:।”[১] অর্থাৎ, আপ্তপুরুষের বাক্য থেকে যে অর্থজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাই আগম। আবার “तद्वचनमपि ज्ञानहेतुत्वादागम:।”[২] সূত্রে বলা হয়েছে যে, আপ্তের বাণীও জ্ঞানের কারণ হওয়ার জন্য আগম নামে পরিচিত। ‘আগম’ শব্দটি ‘আ’ উপসর্গ এবং ‘গম্’ ধাতু থেকে উৎপন্ন। এখানে ‘আ’ উপসর্গের অর্থ সমন্তাৎ বা সর্বতোভাবে এবং ‘গম্’ ধাতুর অর্থ গতি, প্রাপ্তি বা জ্ঞানলাভ। ব্যুৎপত্তিগত অর্থে আগম হলো সেই

১. মহারাজ, কহৈয়ালাল জী। *ন্যায়রত্নসার*। ইন্দোর: আচার্য শ্রী ঘাসীলাল জী মহারাজ, ১৯৮৯, পৃ. ৮২ থেকে উদ্ধৃত।

২. তদেব, পৃ. ৮৩ থেকে উদ্ধৃত।

মাধ্যম, যার দ্বারা কোনো বিষয় বা তত্ত্ব সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ও যথার্থ জ্ঞান লাভ করা যায়। জৈন দর্শন অনুযায়ী প্রকৃত আপ্ত হলেন সেই ব্যক্তি, যাঁর বাণীতে কোনো বিরোধ বা অসত্যতা নেই। তাই বলা হয়েছে—

> "अविसंवादिवचनत्वात्परमार्थतो वीतरागसर्वज्ञहितोपदेष्टैवाप्तस्तीर्थकरादि:, व्यवहारतस्तु लौकिको जनकादि:।"[৩]

অর্থাৎ, পরমার্থদৃষ্টিতে বীতরাগ, সর্বজ্ঞ এবং হিতোপদেশী তীর্থঙ্করগণই প্রকৃত আপ্ত; তবে ব্যবহারিক দৃষ্টিতে জনকাদি প্রামাণিক ব্যক্তিরাও আপ্ত বলে গণ্য হন। মিথ্যা ভাষণের মূল কারণ অজ্ঞান ও কষায় (ক্রোধ, মান, মায়া ও লোভ) হওয়ায়, যাঁদের মধ্যে এই দোষসমূহ নেই, তাঁদের বাণী স্বভাবতই অবিসংবাদী ও প্রামাণিক। এই কারণেই তীর্থঙ্করদের উপদেশ, তাঁদের রচিত আগমশাস্ত্র এবং তাঁদের দ্বারা প্রতিপাদিত তত্ত্বসমূহ জৈন দর্শনে সত্যজ্ঞান লাভের নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হিসেবে গৃহীত হয়েছে। ন্যায়শাস্ত্রেও বলা হয়েছে— "यो यत्रावञ्चक: स तत्राप्त:।"[৪] অর্থাৎ যে ব্যক্তি যে বিষয়ে প্রতারণা করেন না, সেই বিষয়ে তিনি আপ্ত। তবে মুক্তির পথ সম্পর্কে সর্বতোভাবে নির্ভুল জ্ঞান প্রদানকারী তীর্থঙ্করগণই পূর্ণ বা পরমার্থিক আপ্ত।

আগম প্রমাণের ভিত্তি হলো শব্দের মাধ্যমে অর্থবোধ। এই প্রসঙ্গে সূত্রে বলা হয়েছে— "स्वार्थप्रकाशनशक्ति: शब्दानां सहजाऽपि संकेतसहकृतया तयाऽर्थबोध:।"[৫] অর্থাৎ, শব্দের মধ্যে নিজ অর্থ প্রকাশ করার শক্তি স্বভাবতই বিদ্যমান, কিন্তু সংকেত বা প্রচলিত অর্থ-সম্পর্কের সহায়তা ছাড়া সেই শক্তি কার্যকর হয় না। জৈন দর্শনের শব্দতত্ত্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যদি শব্দের মধ্যে তার নিজস্ব অর্থ (বাচ্যার্থ) প্রকাশ করার শক্তি স্বভাবতই বিদ্যমান থাকে, তবে অর্থবোধের জন্য আবার সংকেত বা প্রচলিত ভাষাগত নিয়মের প্রয়োজন কেন? এর উত্তরে জৈন আচার্য বলেন, শব্দের মধ্যে অর্থ প্রকাশ করার স্বাভাবিক যোগ্যতা অবশ্যই আছে, কিন্তু সেই যোগ্যতা কার্যকর হওয়ার জন্য সংকেতের সহায়তা অপরিহার্য। যেমন চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে নিজ নিজ বিষয় গ্রহণ করার স্বাভাবিক ক্ষমতা থাকে, তবুও তারা একা কাজ করতে পারে না; রূপ দেখার জন্য আলোর প্রয়োজন হয়। একইভাবে শব্দের মধ্যেও অর্থবোধক শক্তি স্বাভাবিকভাবে থাকে, কিন্তু "এই শব্দ দ্বারা এই অর্থ বোঝানো হয়"— এই সামাজিক বা ভাষাগত সংকেত জানা না থাকলে শব্দ তার অর্থ প্রকাশ করতে পারে না। অর্থাৎ শব্দের শক্তি ও সংকেত উভয়ের সমন্বয়েই অর্থবোধ সম্ভব হয়।

এরপর আরেকটি আপত্তি উত্থাপিত হয় যে, যদি শব্দ অর্থ প্রকাশের জন্য সংকেতের উপর নির্ভরশীল হয়, তবে কি শব্দের অর্থবোধক শক্তি স্বাভাবিক নয়, বরং সংকেত থেকেই উৎপন্ন হয়? এর উত্তরে বলা হয়েছে যে সংকেত কোনো নতুন শক্তি সৃষ্টি করে না; বরং পূর্বস্থিত শক্তিকে কার্যকর করে তোলে। যে শক্তি কোনো বস্তুর মধ্যে আদৌ নেই, তা সহায়ক কারণ দ্বারা সৃষ্টি করা যায় না। যেমন বন্ধ্যা নারীর মধ্যে সন্তান উৎপাদনের শক্তি নেই; পুরুষের সংযোগেও সেই শক্তি সৃষ্টি হয় না। তেমনি সহায়ক কারণ কখনো সম্পূর্ণ নতুন শক্তি উৎপন্ন করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, বিশেষ সুরমা (নেত্রলেপ) বা অঞ্জনের প্রভাবে চোখ মাটির নিচে লুকিয়ে থাকা কোনো বস্তু দেখতে পারে বলে মনে হলেও, প্রকৃতপক্ষে চোখের মধ্যে রূপগ্রহণের ক্ষমতা পূর্ব থেকেই ছিল; অঞ্জন (নেত্রলেপ) কেবল সেই ক্ষমতার কার্যকারিতা বৃদ্ধি করেছে। কিন্তু চোখকে কখনো এমন করা যায় না যে সে রস বা গন্ধ উপলব্ধি করবে, কারণ তা তার স্বাভাবিক বিষয় নয়। এই যুক্তির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে শব্দের অর্থবোধক শক্তি স্বভাবজাত; সংকেত কেবল সেই শক্তিকে জাগ্রত ও কার্যকর করে। অতএব, শব্দ

৩. মহারাজ, কহ্নৈয়ালাল জী। *ন্যায়রত্নসার*। ইন্দোর: আচার্য শ্রী ঘাসীলাল জী মহারাজ, ১৯৮৯, পৃ. ৮৪ থেকে উদ্ধৃত।

৪. জৈন, শ্রী হীরালাল। *প্রমেয়রত্নমালা*। বারাণসী: চৌখম্বা বিদ্যাভবন, ১৯৬৪, পৃ. ২০৪ থেকে উদ্ধৃত।

৫. মহারাজ, কহ্নৈয়ালাল জী। *ন্যায়রত্নসার*। ইন্দোর: আচার্য শ্রী ঘাসীলাল জী মহারাজ, ১৯৮৯, পৃ. ৩৫ থেকে উদ্ধৃত।

স্বভাবতই অর্থবোধক শক্তিসম্পন্ন হলেও "এই শব্দ থেকে এই অর্থ বোঝাতে হবে"— এইরূপ সংকেতের সহায়তায়ই অর্থ প্রকাশ করে এবং সমগ্র ভাষাগত ও সামাজিক ব্যবহার পরিচালিত হয়। শব্দের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে বলা হয়েছে— "वर्णपदवाक्यात्मक: शब्द:।"[৬] অর্থাৎ শব্দ তিন প্রকার— বর্ণ, পদ ও বাক্য। আবার বর্ণ সম্পর্কে বলা হয়েছে— "कथंचिन्नित्यानित्यात्मक: पौगलिकः स्वरव्यञ्जनरूपो वर्ण:।"[৭] অর্থাৎ স্বর ও ব্যঞ্জনরূপ বর্ণ ভাষাবর্গণা-জাত পুদ্গল হওয়ায় পৌদ্গালিক এবং বিশেষ দৃষ্টিতে নিত্য ও অনিত্য উভয়ই। জৈন দর্শনের অনেকান্তবাদ ও স্যাদ্বাদ তত্ত্বের আলোচনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ আপত্তি উত্থাপিত হয়— যে বস্তুকে একদিকে নিত্য বলা হচ্ছে, তাকেই আবার অনিত্য বলা হচ্ছে; আবার যাকে অনিত্য বলা হচ্ছে, তাকেই নিত্য বলা হচ্ছে। আপত্তিকারীর মতে, এ ধরনের পরস্পরবিরোধী বক্তব্য কোনো দক্ষ চিন্তাবিদের বক্তব্য হতে পারে না। এর উত্তরে জৈন আচার্য বলেন যে প্রকৃত বিরোধ এবং আপাত বিরোধ এক বিষয় নয়। যেখানে সত্যিই পরস্পরবিরোধী ধর্ম একই দৃষ্টিকোণ থেকে একই সময়ে আরোপ করা হয়, সেখানে বিরোধ ঘটে; কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ বা আপেক্ষিকতার ভিত্তিতে একই বস্তুর ভিন্ন ধর্ম নির্দেশ করলে কোনো বিরোধ থাকে না। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি তার পিতার দৃষ্টিতে পুত্র, আবার তার মাতুলের (মামা) দৃষ্টিতে ভাগ্নে। পুত্রত্ব ও ভাগ্নেত্ব পরস্পর ভিন্ন ধর্ম হলেও ভিন্ন আপেক্ষিকতার কারণে একই ব্যক্তির মধ্যে উভয়ই বিদ্যমান থাকে। ঠিক তেমনি শব্দ ভাষাবর্গণার পরিণাম হওয়ায় উৎপন্ন ও পরিবর্তনশীল, এই দৃষ্টিতে তা অনিত্য; আবার ভাষাবর্গণাসমূহ পুদ্গলদ্রব্য হওয়ায় দ্রব্যদৃষ্টিতে শব্দ নিত্য। সুতরাং শব্দে কথঞ্চিৎ নিত্যতা এবং কথঞ্চিৎ অনিত্যতা উভয়ই বিদ্যমান। তাই শব্দকে একান্তভাবে নিত্য বা একান্তভাবে অনিত্য কোনোটিই বলা যায় না। এরপর আপত্তিকারী বলেন যে এই ধরনের অবস্থান যেন 'বেপেন্দির লোটা'র মতো যার কোনো স্থির অবস্থান নেই। জৈন আচার্য এর উত্তরে বলেন, কোনো এক পক্ষকে একচেটিয়াভাবে সমর্থন না করলেই কোনো মত অযৌক্তিক হয়ে যায় না। কারণ বস্তুজগতের স্বরূপই এমন যে তা একান্ত নিত্যও নয়, আবার একান্ত অনিত্যও নয়। যদি কোনো বস্তু সম্পূর্ণ নিত্য হতো, তাহলে তার মধ্যে পরিবর্তন, ক্রিয়া বা কার্যকারিতা সম্ভব হতো না; আবার যদি সম্পূর্ণ অনিত্য হতো, তাহলে তার কোনো ধারাবাহিক অস্তিত্ব বা পরিচয় বজায় থাকত না। ফলে উভয় একান্তবাদই যুক্তিগত সমস্যায় পতিত হয়। জৈন দর্শনের মতে প্রতিটি বস্তুই দ্রব্য, গুণ ও পর্যায়ের সমন্বয়ে গঠিত; দ্রব্যের দৃষ্টিতে নিত্য এবং পর্যায়ের দৃষ্টিতে অনিত্য। এই কারণেই প্রত্যেক পদার্থ অনেকান্তধর্মী। স্যাদ্বাদ কোনো একপাক্ষিক সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে না; বরং বিভিন্ন দৃষ্টিকোণকে সমন্বিত করে বস্তুর পূর্ণাঙ্গ স্বরূপ উপলব্ধি করার চেষ্টা করে। অতএব শব্দের নিত্যতা ও অনিত্যতা সম্পর্কে জৈন অবস্থান কোনো স্ববিরোধ নয়, বরং আপেক্ষিক সত্যের সুসংবদ্ধ দার্শনিক বিশ্লেষণ। পরবর্তীতে পদ ও বাক্যের সংজ্ঞা প্রদান করে বলা হয়েছে— "परस्परापेक्षवर्णानां निरपेक्षसमुदाय: पदं तथाविधपदसमुदायश्च वाक्यम्।"[৮] অর্থাৎ, পরস্পর-নির্ভরশীল বর্ণসমষ্টি পদ এবং পরস্পর-নির্ভরশীল পদসমষ্টি বাক্য নামে পরিচিত। এই বর্ণ, পদ ও বাক্যের মাধ্যমেই অর্থের জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং আপ্তপুরুষের বাণী থেকে জীব, অজীব, কর্ম, পুনর্জন্ম ও মোক্ষতত্ত্ব সম্পর্কিত যে যথার্থ জ্ঞান লাভ করা যায়, তাই আগমজ্ঞান। অতএব, জৈন দর্শনে আগম প্রমাণ কেবল শাস্ত্রীয় কর্তৃত্বের প্রতীক নয়; বরং এটি এমন এক প্রামাণিক জ্ঞানপদ্ধতি, যা সর্বজ্ঞ ও বীতরাগ আপ্তপুরুষের অবিসংবাদী উপদেশের মাধ্যমে সত্যতত্ত্বের উপলব্ধি এবং মুক্তির পথ নির্দেশ করে।

৬. তদেব, পৃ. ৮৮ থেকে উদ্ধৃত।

৭. তদেব, পৃ. ৩৫ থেকে উদ্ধৃত।

৮. মহারাজ, কহ্নৈয়ালাল জী। *ন্যায়রত্নসার*। ইন্দোর: আচার্য শ্রী ঘাসীলাল জী মহারাজ, ১৯৮৯, পৃ. ৩৫ থেকে উদ্ধৃত।

জৈন দর্শনে শব্দতত্ত্ব আলোচনা করতে গিয়ে ন্যায়দর্শনের সেই মতকে খণ্ডন করা হয়েছে, যেখানে শব্দকে আকাশের গুণ বলা হয়। জৈন আচার্যদের মতে শব্দ আকাশের গুণ নয়, বরং পৌদ্গালিক বা পুদ্গালধর্মী পদার্থ। পুদ্গালসমষ্টি হওয়ার কারণে শব্দ মূর্ত। অর্থাৎ তার একটি ভৌত অস্তিত্ব রয়েছে। কিন্তু আকাশ স্বভাবতই অমূর্ত, তাই মূর্ত শব্দ অমূর্ত আকাশের গুণ হতে পারে না। যদি শব্দকে আকাশের গুণ প্রমাণ করার জন্য অমূর্ত বলে গ্রহণ করা হয়, তবে তা শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয় হতে পারবে না। অথচ সকলেই স্বীকার করেন যে শব্দ কর্ণেন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধ হয়। সুতরাং "श्रोत्रग्राह्यो गुण: शब्द:।"[৯] এই সংজ্ঞার যথার্থতা বজায় রাখতে শব্দকে মূর্ত ও পুদ্গালধর্মী বলেই গ্রহণ করতে হবে। জৈন দার্শনিকদের মতে যে সমস্ত বস্তু ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের বিষয়, সেগুলি কোনো না কোনোভাবে মূর্ত। এই মতকে নিম্নলিখিত শ্লোকে প্রকাশ করা হয়েছে— "पुद्गलप्रचय: शब्द: सचित्ताचित्तमिश्रभिद्। न च व्योमगुणस्तावन्मूर्तत्वात् भवितं क्षम:॥"[১০] অর্থাৎ, শব্দ পুদ্গালদ্রব্যের সমষ্টি বা পরিণামের ফল। এর তিনটি প্রধান ভেদ রয়েছে— সচিত্ত, অচিত্ত এবং মিশ্র। সচিত্ত শব্দ জীবের দ্বারা উৎপন্ন হয়, অচিত্ত শব্দ জড় পদার্থের সংঘর্ষ বা ক্রিয়া থেকে উৎপন্ন হয় এবং মিশ্র শব্দে জীব ও জড় উভয়েরই অংশগ্রহণ থাকে। অতএব শব্দও মূর্ত এবং আকাশের গুণ নয়।

জৈনদর্শনের ন্যায় মীমাংসা দর্শনেও শব্দকে আকাশের গুণ বলে স্বীকার করা হয় না; বরং তাকে একটি স্বতন্ত্র দ্রব্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে— "श्रोत्रमात्रेन्द्रियग्राह्यः शब्दः शब्दत्वजातिमान्। द्रव्यं सर्वगतो नित्यः कुमारिलभते मतः॥ वियद्गुणत्वं शब्दस्य केचिदूचुर्मनीषिणः। प्रत्यक्षादिविरोधात् तद् भट्टपादैरुपेक्षितम्॥"[১১] এই শ্লোকদ্বয়ের তাৎপর্য হলো, শব্দ কেবলমাত্র শ্রোত্রেন্দ্রিয় (কর্ণেন্দ্রিয়) দ্বারা উপলব্ধ হয়। শব্দের মধ্যে শব্দত্ব-জাতি বিদ্যমান। কুমারিল ভট্টের মতে শব্দ সর্বব্যাপী, নিত্য এবং দ্রব্য। অতএব শব্দকে আকাশের গুণ বলা যুক্তিসঙ্গত নয়।

কোনো কোনো দার্শনিক শব্দকে আকাশের গুণ বলে অভিহিত করলেও ভট্টপাদ কুমারিল সেই মত গ্রহণ করেননি। কারণ, আকাশগুণরূপে শব্দকে স্বীকার করলে তা প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিরোধী হয়ে দাঁড়ায়। সাধারণ নিয়ম হলো— গুণ সর্বদা তার আশ্রয় বা গুণীর মধ্যেই অবস্থান করে। কিন্তু শব্দকে আকাশে প্রত্যক্ষ করা যায় না। আকাশ স্বভাবতই অমূর্ত, অথচ শব্দকে মূর্ত বলে বিবেচনা করা হয়। ফলে মূর্ত শব্দ অমূর্ত আকাশের গুণ হতে পারে না। এ বিষয়ে একটি উপমা দেওয়া হয় যেমন জ্ঞান আত্মার গুণ, এবং জ্ঞান ও আত্মা উভয়ই অমূর্ত; তাই তাদের মধ্যে গুণ-গুণী সম্পর্ক সম্ভব। কিন্তু শব্দ যদি মূর্ত হয় এবং আকাশ অমূর্ত হয়, তবে তাদের মধ্যে সেই সম্পর্ক স্থাপন করা যুক্তিসঙ্গত নয়। এই কারণেই মীমাংসকগণ শব্দকে আকাশের গুণ না মেনে দ্রব্য হিসেবে স্বীকার করেছেন। এ প্রসঙ্গে ব্যাকরণদর্শনের প্রখ্যাত আচার্য ভর্তৃহরিও বলেছেন— "अभ्राणीव प्रचीयन्ते शब्दाख्याः परमाणवः।"[১২] অর্থাৎ, "মেঘ যেমন আকাশে বিস্তৃত হয়, তেমনি শব্দরূপ পরমাণুগুলিও প্রসারিত হয়।" এই উক্তির মাধ্যমে ভর্তৃহরি শব্দকে পরমাণুর সমষ্টি হিসেবে বুঝিয়েছেন। ফলে শব্দকে একটি স্বতন্ত্র দ্রব্যরূপে ব্যাখ্যা করার প্রবণতা আরও শক্তিশালী হয়। সুতরাং মীমাংসা দর্শনের এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী শব্দ কোনোভাবেই আকাশের গুণ নয়; বরং তা নিত্য, সর্বব্যাপী এবং স্বতন্ত্র সত্তাসম্পন্ন একটি দ্রব্য।

---

৯. মিশ্র, বিশ্বনাথ। *জৈনন্যায়পঞ্চশতী*। রাজস্থান: জৈন বিশ্বভারতী সংস্থান, ২০১২, পৃ. ৯২ থেকে উদ্ধৃত।

১০. তদেব, পৃ. ৮৫ থেকে উদ্ধৃত।

১১. মিশ্র, বিশ্বনাথ। *জৈনন্যায়পঞ্চশতী*। রাজস্থান: জৈন বিশ্বভারতী সংস্থান, ২০১২, পৃ. ৮৮ থেকে উদ্ধৃত।

১২. মিশ্র, বিশ্বনাথ। *জৈনন্যায়পঞ্চশতী*। রাজস্থান: জৈন বিশ্বভারতী সংস্থান, ২০১২, পৃ. ৮৮ থেকে উদ্ধৃত।

ব্যাকরণশাস্ত্রেও শব্দকে আকাশের গুণ বলে মানা হয় না; বরং আকাশের একটি বিশেষ প্রকাশ বা অবস্থিতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এই প্রসঙ্গে ব্যাকরণ-মহাভাষ্যে বলা হয়েছে— "শ্রোত্রোপলব্ধির্বুদ্ধিনির্গ্রাহ্যঃ প্রয়োগেণাভিজ্বলিতঃ আকাশদেশঃ শব্দঃ।"[১৩] অর্থাৎ, শব্দ এমন একটি সত্তা যা কর্ণেন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধ হয়, বুদ্ধি দ্বারা গৃহীত বা অনুধাবিত হয় এবং প্রয়োগের মাধ্যমে প্রকাশিত ও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এইরূপ শব্দকে আকাশের একটি বিশেষ অবস্থিতি বা প্রকাশরূপে (আকাশদেশ) অভিহিত করা হয়েছে। অতএব, ব্যাকরণদর্শনের মতে শব্দ আকাশের গুণমাত্র নয়; বরং আকাশের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত একটি স্বতন্ত্র সত্তা। এই কারণেই ব্যাকরণশাস্ত্রে শব্দের আকাশগুণত্বের ধারণা গ্রহণ করা হয় না, বরং তাকে আকাশদেশরূপে ব্যাখ্যা করা হয়।

পরবর্তীতে গ্রন্থকার শব্দ ও ধ্বনির প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন যে উভয়ই রূপযুক্ত, পুদ্গলধর্মী এবং বর্ণ, গন্ধ, রস ও স্পর্শবিশিষ্ট পুদ্গলসমষ্টি। আকাশে সৃষ্ট কোনো কম্পন বা ক্ষোভ যখন বায়ুতরঙ্গের মাধ্যমে কর্ণে পৌঁছে শ্রুতিগোচর হয়, তখন তাকে শব্দ বলা হয়। এই শব্দ দুই প্রকার— বর্ণাত্মক এবং ধ্বন্যাত্মক। কণ্ঠযন্ত্র বা স্বরযন্ত্র থেকে উৎপন্ন শব্দ বর্ণাত্মক, আর মৃদঙ্গ, তাল, বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি থেকে উৎপন্ন শব্দ ধ্বন্যাত্মক। আধুনিক প্রযুক্তির উদাহরণ দিয়ে বলা হয়েছে যে যেমন দূরভাষ, রেকর্ডার বা অন্যান্য যন্ত্রে শব্দ ও ধ্বনি ধারণ, সংরক্ষণ এবং পুনরুৎপাদন করা যায়, তেমনি এদের ভৌত অস্তিত্বও প্রমাণিত হয়। যন্ত্র কেবল মূর্ত বস্তুকেই ধারণ করতে পারে; অমূর্ত পদার্থকে নয়। অতএব শব্দ ও ধ্বনির ধারণ ও সংরক্ষণ সম্ভব হওয়াই প্রমাণ করে যে উভয়ই পুদ্গলধর্মী এবং মূর্ত। এই যুক্তির মাধ্যমে জৈন দর্শন শব্দকে আকাশগুণ না মেনে একটি স্বতন্ত্র ভৌত বাস্তব তত্ত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

শব্দ, পদ, বাক্য এবং সপ্তভঙ্গী তত্ত্বের আলোচনায় জৈন দর্শন ভাষা ও জ্ঞানের গভীর সম্পর্ককে বিশ্লেষণ করেছে। যখন একাধিক বর্ণ এমনভাবে সংযুক্ত হয় যে তারা আর কোনো অতিরিক্ত বর্ণের প্রত্যাশা না করে একটি নির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ করতে সক্ষম হয়, তখন তাকে পদ বলা হয়; আর অর্থবহ পদসমূহের সমষ্টি, যা একটি পূর্ণ ভাব প্রকাশ করে, তাকে বাক্য বলা হয়। তবে কেবল অর্থবহ বর্ণসমষ্টিকেই পদ বলা যায়; অর্থহীন বর্ণসমষ্টি পদ নয়। জৈন আচার্যদের মতে শব্দের স্বাভাবিক ধর্ম হলো অর্থ প্রকাশ করা। তাই "निवारणप्रदीपवत्स्वार्थप्रकाशनं शब्दे सङ्केताधीनमपि वेधे प्रमाणेतरता वक्तृगुणदोषनिश्रा।"[১৪] সূত্রে শব্দকে প্রদীপের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। যেমন প্রদীপ কোনো বস্তু ভালো না মন্দ, ইষ্ট না অনিষ্ট— এই বিচার না করে কেবল তাকে প্রকাশ করে, তেমনি শব্দও সংকেতের সাহায্যে তার বাচ্যার্থকে প্রকাশ করে। কিন্তু সেই জ্ঞান প্রমাণ (যথার্থ) হবে না অপ্রমাণ (অযথার্থ) হবে, তা নির্ভর করে বক্তার গুণ ও দোষের উপর। এই কারণেই বলা হয়— "वक्तु: प्रमाण्याद्वचसि प्रामाण्यम्।"[১৫] অর্থাৎ বক্তা যদি বিশ্বস্ত ও দোষমুক্ত হন, তবে তাঁর বাণীও প্রামাণিক হবে; আর বক্তা যদি অজ্ঞ বা পক্ষপাতদুষ্ট হন, তবে তাঁর বাক্য থেকে উৎপন্ন জ্ঞানও অপ্রামাণিক হতে পারে।

জৈন দর্শনের অনেকান্তবাদ ও স্যাদ্বাদ তত্ত্বের ভিত্তিতে শব্দের অর্থপ্রকাশকে আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। "आदेशभेदाच्छब्द: स्वार्थे विधिनिषेधाभ्यां सप्तभंग्यालिङ्ग्यते।"[১৬] সূত্রে বলা হয়েছে যে, কোনো বস্তুর

---

১৩. মিশ্র, বিশ্বনাথ। *জৈনন্যায়পঞ্চশতী*। রাজস্থান: জৈন বিশ্বভারতী সংস্থান, ২০১২, পৃ. ৮৬ থেকে উদ্ধৃত।

১৪. মহারাজ, কন্হৈয়ালাল জী। *ন্যায়রত্নসার*। ইন্দোর: আচার্য শ্রী ঘাসীলাল জী মহারাজ, ১৯৮৯, পৃ. ৩৬ থেকে উদ্ধৃত।

১৫. তদেব, পৃ. ৩৬ থেকে উদ্ধৃত।

১৬. মহারাজ, কন্হৈয়ালাল জী। *ন্যায়রত্নসার*। ইন্দোর: আচার্য শ্রী ঘাসীলাল জী মহারাজ, ১৯৮৯, পৃ. ৩৬ থেকে উদ্ধৃত।

অনন্ত ধর্মের মধ্যে বিশেষ কোনো ধর্মকে উদ্দেশ্য করে শব্দ কখনও বিধির (অস্তিত্বের), কখনও নিষেধের (অনস্তিত্বের), আবার কখনও উভয়ের সমন্বয়ে অর্থ প্রকাশ করে; এর ফলেই সপ্তভঙ্গীর উদ্ভব হয়। তাই "एकत्रैकधर्मप्रश्नविवक्षातोऽविरोधेन व्यस्तसमस्तविधिनिषेधयो: प्रतिपादक: स्याच्छिह्नित: सप्तधा वाक्यप्रयोग: सप्तभंग:।"[১৭] সূত্রে সপ্তভঙ্গীকে সাত প্রকার বক্তব্যের সমষ্টি হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যেখানে প্রত্যেক বক্তব্য 'স্যাৎ' শব্দ দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে। জৈন দর্শনের সপ্তভঙ্গী বা স্যাদ্বাদ তত্ত্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। আপত্তিকারী বলেন, যদি কোনো বস্তুর স্বচতুষ্টয়ের (নিজ দ্রব্য, ক্ষেত্র, কাল ও ভাব) দৃষ্টিতে তার সত্তা (অস্তিত্ব) স্বীকৃত হয় এবং পরচতুষ্টয়ের (অন্য দ্রব্য, ক্ষেত্র, কাল ও ভাব) দৃষ্টিতে তার অসত্তা (অনস্তিত্ব) স্বীকৃত হয়, তবে সত্তা ও অসত্তাকে পৃথক ধর্ম হিসেবে মানার প্রয়োজন কী? একই সত্তা অন্যের তুলনায় অসত্তা এবং একই অসত্তা নিজের তুলনায় সত্তা বলে গ্রহণ করলেই তো হয়। সে ক্ষেত্রে 'স্যাদস্তি' অথবা 'স্যান্নাস্তি'— এই দুই ভঙ্গের মধ্যেই সমস্ত আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকবে; সাতটি ভঙ্গের প্রয়োজন থাকবে না। এই আপত্তির উত্তরে জৈন আচার্য বলেন যে সত্তা ও অসত্তাকে পরস্পরের রূপান্তর বলে মনে করলে গুরুতর যুক্তিগত অসুবিধা দেখা দেয়। যদি ঘটের স্বসত্তাকেই পটের তুলনায় অসত্তা বলা হয়, তবে একই ঘটে পরচতুষ্টয়ের দৃষ্টিতেও সত্তা স্বীকার করতে হবে। আবার যদি ঘটের অসত্তাকেই তার সত্তা বলে ধরা হয়, তবে স্বচতুষ্টয়ের দৃষ্টিতেও অসত্তা মানতে হবে। ফলে সত্তা ও অসত্তার মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং কোনো নির্দিষ্ট বিচার সম্ভব হবে না। তাই জৈন দার্শনিকদের মতে সত্তা ও অসত্তা উভয়ই স্বতন্ত্র ধর্ম; তাদের নিজস্ব অবস্থান আছে। এই স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করলেই সপ্তভঙ্গীর অবশিষ্ট ভঙ্গসমূহের যথার্থতা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অনেকান্তবাদের পূর্ণাঙ্গ রূপ প্রকাশ পায়।

এরপর সূত্রকার সপ্তভঙ্গীর গঠন ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেছেন। সূত্রে ব্যবহৃত 'একত্র' পদ দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে সপ্তভঙ্গীর সাতটি বিচার একটিমাত্র বস্তুকে আশ্রয় করেই সম্পন্ন হয়; বিভিন্ন বস্তুর উপর নির্ভর করে নয়। অর্থাৎ একই বস্তুর মধ্যে বিভিন্ন আপেক্ষিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিধি (স্বীকৃতি) ও নিষেধ (অস্বীকৃতি) বিচার করেই সপ্তভঙ্গী গঠিত হয়। আবার 'অবিরোধেন' পদটি নির্দেশ করে যে এই বিচার প্রত্যক্ষ, অনুমান বা অন্যান্য প্রমাণের সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি করে না; বরং একান্তবাদী মতগুলির সীমাবদ্ধতা দূর করে। সূত্রে নিহিত 'স্যাদ্' শব্দটি 'কথঞ্চিৎ' বা "এক নির্দিষ্ট আপেক্ষিকতা থেকে" এই অর্থ প্রকাশ করে, যা স্যাদ্বাদের মূল ভিত্তি। আর 'সপ্তভঙ্গী' পদটি স্পষ্ট করে যে একটি বস্তুর কোনো নির্দিষ্ট ধর্ম সম্পর্কে বিধি ও নিষেধের সম্ভাব্য সকল যৌক্তিক অবস্থান বিবেচনা করলে ঠিক সাতটিই ভঙ্গ হয়— না ছয়, না আট। এই সাতটি ভঙ্গের মাধ্যমেই জৈন দর্শন বস্তুর বহুমাত্রিক ও আপেক্ষিক স্বরূপকে ব্যাখ্যা করে এবং একান্তবাদী চিন্তার পরিবর্তে সমন্বয়মূলক অনেকান্তবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিষ্ঠা করে। এর প্রথম রূপ হলো "स्यात्सदेव सर्वमिति प्राधान्येन विधिविवक्षया प्रथमो भंग:।"[১৮] অর্থাৎ কোনো নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে সকল বস্তু সৎ বা অস্তিত্বশীল। আবার দ্বিতীয় রূপ হলো "स्यादसदेव सर्वमिति प्राधान्येन निषेधविवक्षया द्वितीयो भंग:।"[১৯] অর্থাৎ অন্য কোনো দৃষ্টিকোণ থেকে সেই একই বস্তু অসৎ বা অনস্তিত্বশীল। এখানে অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব পরস্পর বিরোধী নয়, কারণ তারা একই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয় না; স্বদ্রব্য, স্বক্ষেত্র, স্বকাল ও স্বভাবের দৃষ্টিতে বস্তু বিদ্যমান, আবার পরদ্রব্য, পরক্ষেত্র, পরকাল ও পরভাবের দৃষ্টিতে অনস্তিত্বশীল বলা যায়। তৃতীয় ভঙ্গ সম্পর্কে বলা হয়েছে— "स्यात्सदेव स्यादसदेवेति

---

১৭. ন্যায়াচার্য, শ্রীসতীন্দ্রচন্দ্র। *জৈনদর্শনের দিগ্‌দর্শন*। কলকাতা: সংস্কৃত কলেজ, ১৯৭৫, পৃ. ৪ থেকে উদ্ধৃত।

১৮. মহারাজ, কন্থৈয়ালাল জী। *ন্যায়রত্নসার*। ইন্দোর: আচার্য শ্রী ঘাসীলাল জী মহারাজ, ১৯৮৯, পৃ. ৩৭ থেকে উদ্ধৃত।

১৯. তদেব, পৃ. ৩৭ ।

ক্রমশো বিধি-নিষেধবিবক্ষয়া তৃতীয়োভংগ:।”[২০] অর্থাৎ, কোনো বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে বস্তু সৎ (অস্তিত্বশীল) এবং অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে অসৎ (অনস্তিত্বশীল); এইভাবে ক্রমানুসারে বিধি (অস্তিত্ব) ও নিষেধ (অনস্তিত্ব)-এর বিবক্ষার মাধ্যমে তৃতীয় ভঙ্গ গঠিত হয়। যখন কোনো বস্তুকে তার স্বরূপের দিক থেকে বিচার করা হয়, তখন তাকে অস্তিত্ববিশিষ্ট বলা হয়; আবার পররূপ বা ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে তাকে অনস্তিত্ববিশিষ্ট বলা হয়। এরপর চতুর্থ ভঙ্গের সূত্র— “স্যাদবক্তব্যমেবেতি যুগপত্ প্রাধান্যেন বিধিনিষেধবিবক্ষয়া চতুর্থ:।”[২১] এখানে অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব উভয় ধর্মকে একই সঙ্গে প্রধান করে প্রকাশ করতে গেলে বস্তু ‘অবক্তব্য’ বা ভাষায় সম্পূর্ণরূপে প্রকাশাতীত হয়ে পড়ে। কারণ বস্তু অনন্ত ধর্মসমষ্টির আধার; ফলে তার সমস্ত ধর্মকে একই মুহূর্তে ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। পঞ্চম ভঙ্গের সূত্র— “আদ্যতুর্যযোর্যোগে পংচম:।”[২২] অর্থাৎ প্রথম ও চতুর্থ ভঙ্গের সমন্বয়ে “স্যাত্সদেব স্যাদবক্তব্যমেব”[২৩] রূপ পঞ্চম ভঙ্গের উদ্ভব হয়। এখানে বস্তু একদিকে অস্তিত্ববিশিষ্ট, আবার অন্যদিকে অবক্তব্য। ষষ্ঠ ভঙ্গের সূত্র— “দ্বিতীযতূর্যযোর্যোগে ষষ্ঠ:।”[২৪] অর্থাৎ দ্বিতীয় ও চতুর্থ ভঙ্গের সমন্বয়ে “স্যান্নাস্ত্যেব সর্বমবক্তব্যং চ”[২৫] রূপ ষষ্ঠ ভঙ্গের সৃষ্টি হয়, যেখানে বস্তু অনস্তিত্ববিশিষ্ট হলেও একই সঙ্গে অবক্তব্য। সর্বশেষে সপ্তম ভঙ্গের সূত্র— “ক্রমাক্রমাভ্যাং বিধি-প্রতিষেধকল্পনারূপঃ সপ্তম:।”[২৬] এখানে তৃতীয় ও চতুর্থ ভঙ্গের সমন্বয়ে বস্তু একদিকে ক্রমানুসারে অস্তি-নাস্তি এবং অন্যদিকে যুগপৎ অবক্তব্য বলে বিবেচিত হয়। এইভাবে অস্তি, নাস্তি ও অবক্তব্য— এই তিনটি মৌলিক ভঙ্গের বিভিন্ন সমন্বয়ে সাতটি ভঙ্গের সৃষ্টি হয়, যা জৈন অনেকান্তবাদের মৌলিক ভিত্তি। সপ্তভঙ্গীতত্ত্বকে এভাবেও প্রকাশ করা যায়—

ধরা যাক, A, B এবং C তিনটি স্বতন্ত্র ঘটনা (Independent Events) এবং P সম্ভাবনা (Probability)-এর পরিমাপক। এখানে ‘.’ চিহ্নটি সংযোজন বা Conjunction নির্দেশ করে।

যদিও সপ্তভঙ্গীর প্রতিটি ভঙ্গ স্বতন্ত্র ঘটনা নয়, তথাপি এই স্বতন্ত্র ঘটনাগুলির বৈশিষ্ট্য অনেকাংশে সপ্তভঙ্গীর তিনটি মৌলিক ভঙ্গের অনুরূপ। এই ব্যবহারিক সাদৃশ্যের ভিত্তিতে স্যাদস্তি-কে P(A), স্যান্নাস্তি-কে P(~B) এবং স্যাদবক্তব্য-কে P(~C) দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে। এখানে P ‘স্যাৎ’ পদটির প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। অবশ্য এই প্রতীকগুলির অর্থ সম্ভাব্যতা তত্ত্বে ব্যবহৃত প্রতীকগুলির অর্থের সঙ্গে সম্পূর্ণ অভিন্ন নয়; কেবল প্রতীকী উপস্থাপনার সুবিধার্থে এগুলি গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রতীকগুলির সাহায্যে সপ্তভঙ্গীর নিম্নলিখিত রূপায়ণ করা যায়—

১. স্যাদস্তি = P(A)
২. স্যান্নাস্তি = P(~B)
৩. স্যাদস্তি চ নাস্তি = P(A.~B)
৪. স্যাদবক্তব্য = P(~C)

---

২০. মহারাজ, কন্হৈয়ালাল জী। *ন্যায়রত্নসার*। ইন্দোর: আচার্য শ্রী ঘাসীলাল জী মহারাজ, ১৯৮৯, পৃ. ৩৭ থেকে উদ্ধৃত।

২১. মহারাজ, কন্হৈয়ালাল জী। *ন্যায়রত্নসার*। ইন্দোর: আচার্য শ্রী ঘাসীলাল জী মহারাজ, ১৯৮৯, পৃ. ৩৮ থেকে উদ্ধৃত।

২২. তদেব, পৃ. ৩৮ ।

২৩. তদেব, পৃ. ৩৮ ।

২৪. মহারাজ, কন্হৈয়ালাল জী। *ন্যায়রত্নসার*। ইন্দোর: আচার্য শ্রী ঘাসীলাল জী মহারাজ, ১৯৮৯, পৃ. ৩৮ থেকে উদ্ধৃত।

২৫. মহারাজ, কন্হৈয়ালাল জী। *ন্যায়রত্নসার*। ইন্দোর: আচার্য শ্রী ঘাসীলাল জী মহারাজ, ১৯৮৯, পৃ. ৩৮ থেকে উদ্ধৃত।

২৬. তদেব, পৃ. ৩৮ ।

৫. স্যাদস্তি চ অবক্তব্য = P(A.~C)

৬. স্যান্নাস্তি চ অবক্তব্য = P(~B.~C)

৭. স্যাদস্তি চ নাস্তি চ অবক্তব্য চ = P(A.~B.~C)

সপ্তভঙ্গী তত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে জৈন আচার্যরা দেখিয়েছেন যে, যদি কেবল 'স্যাদস্তি' বা অস্তিত্বকেই সত্য ধরা হয়, তবে প্রতিটি বস্তু সর্বত্র ও সর্বকালে বিদ্যমান বলে মেনে নিতে হবে, যা বাস্তব অভিজ্ঞতার বিরোধী। আবার যদি কেবল 'স্যান্নাস্তি' বা অনস্তিত্বকে সত্য ধরা হয়, তবে সমস্ত দৃশ্যমান জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করতে হবে, যা সমানভাবে অযৌক্তিক। এই কারণেই অস্তি ও নাস্তি উভয়কেই আপেক্ষিক সত্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। একটি বস্তু স্বদ্রব্য, স্বক্ষেত্র, স্বকাল ও স্বভাবের দৃষ্টিতে অস্তিত্বশীল, কিন্তু পরদ্রব্য, পরক্ষেত্র, পরকাল ও পরভাবের দৃষ্টিতে অনস্তিত্বশীল হতে পারে। এই তত্ত্বের মাধ্যমে জৈন দর্শন একান্তবাদ বা একপাক্ষিক সত্যের বিরোধিতা করেছে। এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে— "विधेरिव निषेधस्यापि बोधकत्वाच्छब्दात्तत्प्रतिपत्तिः।"[২৭] অর্থাৎ, শব্দ যেমন অস্তিত্বের বোধক, তেমনি অনস্তিত্বেরও বোধক। তাই শব্দ কেবল বিধি বা অস্তিত্বই প্রকাশ করে এই ধারণা গ্রহণযোগ্য নয়। পরবর্তী সূত্রে বলা হয়েছে— "गुणभावे नैव तदभिधाने तत्र गौणत्वानुपपत्तिः।"[২৮] অর্থাৎ, যদি শব্দকে কেবল অস্তিত্বের প্রধান বাচক এবং অনস্তিত্বের গৌণ বাচক বলা হয়, তবে অনস্তিত্বে কোনোদিন প্রধানতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে না। বাস্তবে শব্দ কখনো অস্তিত্বকে, কখনো অনস্তিত্বকে এবং কখনো উভয়কেই প্রধান করে প্রকাশ করে। এইভাবে জৈন দর্শনের সপ্তভঙ্গী তত্ত্ব বাস্তবতার বহুমুখী প্রকৃতিকে স্বীকার করে এবং দেখায় যে কোনো বস্তুকে একমাত্রিক বা একান্ত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে তার পূর্ণ সত্য উপলব্ধি করা যায় না।

জৈন দর্শনের সপ্তভঙ্গী তত্ত্বে কোনো একক ভঙ্গকে চূড়ান্ত ও একমাত্র সত্য বলে গ্রহণ করা হয় না; বরং প্রত্যেক ভঙ্গই আপেক্ষিক সত্যের প্রকাশক। এই কারণে

"मुख्यत्वेन निषेधैकान्तवाच्योक्तिरप्येकान्तोक्तयुक्तेः।"[২৯]

সূত্রে বলা হয়েছে যে, যদি কেউ মনে করেন শব্দ কেবলমাত্র প্রধানভাবে নিষেধ বা নাস্তিত্বেরই বাচক, তবে সেই মত গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ এমন ধারণা গ্রহণ করলে অস্তিত্ব বা বিধির জ্ঞান লাভের কোনো উপায় অবশিষ্ট থাকে না। আবার নিষেধকে গৌণ এবং বিধিকে প্রধান কিংবা বিধিকে গৌণ এবং নিষেধকে প্রধান বললেও সমস্যা দেখা দেয়, কারণ গৌণতার জন্য পূর্বে প্রধানতার স্বীকৃতি অপরিহার্য। পরবর্তী সূত্রে—

"विधि-निषेधान्यतरप्रतिपादनस्य प्रधानता शब्दे क्रमादुभयैकान्तप्राधान्यमस्तंगमयति।"[৩০]

এই মতও খণ্ডন করা হয়েছে যে শব্দ কেবল ক্রমানুসারে অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব উভয়েরই বাচক, কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে প্রথম ও দ্বিতীয় ভঙ্গের বাচক নয়। জৈন আচার্যদের মতে, যদি অস্তি ও নাস্তি পৃথকভাবে প্রতিষ্ঠিত না হয়, তবে তাদের ক্রমিক সমন্বয়ে তৃতীয় ভঙ্গেরও কোনো অর্থ থাকে না। একইভাবে "अवक्तव्यशब्देनापि वाच्यत्वाभावप्रसङ्गतश्चतुर्थभङ्गैकान्तोऽप्येकान्तः।"[৩১] সূত্রে চতুর্থ ভঙ্গের একান্ততাও খণ্ডন করা হয়েছে। যদি বলা

২৭. মহারাজ, কহৈয়ালাল জী। *ন্যায়রত্নসার*। ইন্দোর: আচার্য শ্রী ঘাসীলাল জী মহারাজ, ১৯৮৯, পৃ. ৩৯ থেকে উদ্ধৃত।

২৮. তদেব, পৃ. ৩৯ ।

২৯. তদেব, পৃ. ৩৯ ।

৩০. মহারাজ, কহৈয়ালাল জী। *ন্যায়রত্নসার*। ইন্দোর: আচার্য শ্রী ঘাসীলাল জী মহারাজ, ১৯৮৯, পৃ. ৪০ থেকে উদ্ধৃত।

৩১. তদেব, পৃ. ৪০ ।

হয় যে বস্তু সম্পূর্ণরূপে অবক্তব্য, তবে 'অবক্তব্য' শব্দটিও তার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাবে না। অতএব বস্তু সর্বতোভাবে অবর্ণনীয় নয়; বরং বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে অবক্তব্য। পরবর্তী সূত্র "इतरथापि संवेदनाच्छेषभङ्गत्रयमेकान्तोऽप्येवमेव।"[৩২] অনুসারে পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম ভঙ্গের ক্ষেত্রেও একই নীতি প্রযোজ্য। অর্থাৎ কোনো এক ভঙ্গকে একমাত্র সত্য বলে গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত নয়; কারণ শব্দ কখনো অস্তিত্ব, কখনো অনস্তিত্ব, কখনো উভয়ের সমন্বয় এবং কখনো অবক্তব্যতার দিক নির্দেশ করে। এভাবেই জৈন দর্শন একান্তবাদকে প্রত্যাখ্যান করে বহুমাত্রিক সত্যের ধারণাকে প্রতিষ্ঠা করেছে।

সপ্তভঙ্গীর ব্যাপ্তি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে "धर्मं धर्मं प्रति सप्तभङ्गसद्भावतोऽनन्ता: सप्तभङ्ग्य: प्रश्न-जिज्ञासा-संशयतद्गोचरांशानां सप्तविधत्वात्।"[৩৩] সূত্রে বলা হয়েছে যে, বস্তুর প্রতিটি ধর্মকে কেন্দ্র করে পৃথকভাবে সাতটি ভঙ্গ প্রযোজ্য হয়। যেহেতু প্রত্যেক বস্তুই অনন্ত ধর্মবিশিষ্ট, তাই তার উপর অসংখ্য সপ্তভঙ্গীর প্রয়োগ সম্ভব। জিজ্ঞাসা, সংশয় ও তাদের বিষয়ভেদে এই সাতটি ভঙ্গের উদ্ভব ঘটে। পরবর্তীতে "सप्तभङ्गीयं प्रतिभङ्गं सकलादेश-विकलादेशभेदाद् द्विविधा।"[৩৪] সূত্রে সপ্তভঙ্গীর দুই প্রকার— সকলাদেশ ও বিকলাদেশ নির্দেশ করা হয়েছে। সকলাদেশকে প্রমাণসপ্তভঙ্গী এবং বিকলাদেশকে নয়সপ্তভঙ্গী বলা হয়। প্রমাণ সমগ্র বস্তুকে বিষয় করে, আর নয় বস্তুর কোনো এক বিশেষ দিককে বিষয় করে। এই ধারণাকে আরও স্পষ্ট করে "द्रव्यपर्यायाविष्टेन कालादिभिरभेदेनाभेदोपचारेण च सकलवस्तुन: प्रतिपादकत्वं सकलादेशत्वम्।"[৩৫] সূত্রে সকলাদেশের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কোনো বস্তুর একটি ধর্মকে প্রকাশ করলেও যদি সেই ধর্মের সঙ্গে অন্যান্য সমস্ত ধর্মের কাল, স্বভাব, অর্থ, সম্পর্ক, উপকার, গুণ, দেশ, সংযোগ ও শব্দগত ঐক্য কল্পনা করে সমগ্র বস্তুর জ্ঞান লাভ করা যায়, তবে সেটিই সকলাদেশ। উদাহরণস্বরূপ, কোনো ঘটের অস্তিত্ব ধর্মকে প্রকাশ করলে তার সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য ধর্মও পরোক্ষভাবে গৃহীত হয়; ফলে একটি ধর্মের মাধ্যমে সমগ্র বস্তুর জ্ঞান সম্ভব হয়। এই কারণেই সকলাদেশকে প্রমাণবাক্য বলা হয়। জৈন দর্শনের মতে, কোনো বস্তুর অনন্ত ধর্মকে একসঙ্গে ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব হলেও, একটি ধর্মের মাধ্যমে অন্য ধর্মগুলির সঙ্গে অভেদ সম্পর্ক স্থাপন করে সমগ্র বস্তুর যথার্থ জ্ঞান অর্জন করা যায়। এটিই সকলাদেশ বা প্রমাণসপ্তভঙ্গীর মূল তাৎপর্য।

জৈন দর্শনে সপ্তভঙ্গীর দুটি প্রধান রূপের মধ্যে বিকলাদেশ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি বস্তুর সমগ্র স্বরূপ নয়, বরং তার কোনো একটি নির্দিষ্ট ধর্মকে প্রধান করে প্রতিপাদন করে। এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে — "एकधर्ममूलेन भेदं कृत्वा वस्तुप्रतिपादकवाक्यत्वं विकलादेशत्वम्।"[৩৬] অর্থাৎ, কোনো বস্তুর অনন্ত ধর্মের মধ্যে একটি বিশেষ ধর্মকে পৃথকভাবে বিবেচনা করে সেই ধর্মের মাধ্যমে বস্তুর পরিচয় প্রদান করাই বিকলাদেশ। উদাহরণস্বরূপ, "जीव: स्यादस्तिरूप:"— এই বাক্যে জীবদ্রব্যের অসংখ্য ধর্মের মধ্যে কেবল 'অস্তিত্ব' ধর্মকে প্রধান করা হয়েছে। এখানে জীবের সমগ্র স্বরূপের আলোচনা করা হয়নি; বরং একটি নির্দিষ্ট ধর্মকে কেন্দ্র করে জীবকে বর্ণনা করা হয়েছে। এই ধরনের বক্তব্যকে নয়বাক্য বলা হয় এবং এটিই বিকলাদেশের প্রকৃত রূপ। জৈন অনেকান্তবাদ অনুসারে প্রত্যেক বস্তুই অনন্ত ধর্মবিশিষ্ট; ফলে কোনো একটি ধর্মকে কেন্দ্র করে করা বক্তব্য আংশিক সত্য প্রকাশ করে। তবে সেই আংশিক সত্যও যথার্থ, কারণ তা বস্তুর একটি বাস্তব দিককে

---

৩২. তদেব, পৃ. ৪০ ।

৩৩. মহারাজ, কন্হৈয়ালাল জী। *ন্যায়রত্নসার*। ইন্দোর: আচার্য শ্রী ঘাসীলাল জী মহারাজ, ১৯৮৯, পৃ. ৪০ থেকে উদ্ধৃত।

৩৪. মহারাজ, কন্হৈয়ালাল জী। *ন্যায়রত্নসার*। ইন্দোর: আচার্য শ্রী ঘাসীলাল জী মহারাজ, ১৯৮৯, পৃ. ৪১ থেকে উদ্ধৃত।

৩৫. মহারাজ, কন্হৈয়ালাল জী। *ন্যায়রত্নসার*। ইন্দোর: আচার্য শ্রী ঘাসীলাল জী মহারাজ, ১৯৮৯, পৃ. ৪১ থেকে উদ্ধৃত।

৩৬. তদেব, পৃ. ৪২ থেকে উদ্ধৃত।

প্রকাশ করে। এইভাবে বিকলাদেশ নয়বাদের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে এবং বস্তুর বিশেষ বা আংশিক স্বরূপের জ্ঞান প্রদান করে।

এরপর জৈন আচার্যগণ জ্ঞানের প্রকৃতি এবং জ্ঞেয়বস্তুর সঙ্গে তার সম্পর্ক আলোচনা করেছেন। "विषयाजन्यमपि ज्ञानं स्वावरणक्षयोपशमादिना तं प्रदीपवत्प्रकाशयति।"[৩৭] সূত্রে বলা হয়েছে যে, জ্ঞান কোনো বস্তুর দ্বারা উৎপন্ন না হলেও প্রদীপের মতো সেই বস্তুকে প্রকাশ করে। যেমন প্রদীপ ঘট বা পট থেকে উৎপন্ন হয় না, তবুও তাদের আলোকিত করে; তেমনি জ্ঞানও বিষয়বস্তু থেকে উৎপন্ন না হয়েও তাকে জানে। জৈন দর্শন অনুযায়ী জ্ঞানের প্রকাশক্ষমতা নির্ভর করে জ্ঞানাবরণীয় কর্মের ক্ষয়োপশমের উপর। তাই যে জ্ঞানের আবরণ দূর হয়, সেই জ্ঞান সংশ্লিষ্ট বস্তুকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। এই প্রসঙ্গে বৌদ্ধদের 'তদুৎপত্তি' ও 'তদাকারতা' মতের সমালোচনা করে বলা হয়েছে— "न ते तदङ्गं तयोर्व्यस्तसामस्त्येन व्यभिचारितत्वात्।"[৩৮] অর্থাৎ, কোনো জ্ঞান যে বস্তু থেকে উৎপন্ন হয়েছে বা যার আকৃতি ধারণ করেছে, শুধুমাত্র সেই কারণেই যে সে সেই বস্তুকে জানবে— এ কথা সর্বত্র সত্য নয়। কারণ এই মতের মধ্যে নানা ব্যতিক্রম দেখা যায়। জৈন দর্শনের মতে, জ্ঞানের বিষয়নির্ধারণের প্রকৃত কারণ হলো তার নিজস্ব আবরণকর্মের ক্ষয়োপশম। অবশেষে "प्रमाणविषयी भूतोऽर्थ: सामान्यविशेषाद्यनेकान्तात्मक:।"[৩৯] সূত্রে বলা হয়েছে যে, প্রমাণজ্ঞান এমন এক বস্তুকে অবলম্বন করে যা সাধারণ (সামান্য) ও বিশেষ উভয় ধর্মে সমন্বিত এবং অনেকান্তাত্মক। কোনো বস্তু কেবল সাধারণ ধর্মযুক্ত বা কেবল বিশেষ ধর্মযুক্ত নয়; বরং উভয়ের সমন্বয়েই তার প্রকৃত স্বরূপ গঠিত হয়। এই কারণেই জৈন দর্শন সাধারণ ও বিশেষ উভয় ধর্মবিশিষ্ট বহুস্তরীয় বাস্তবতাকেই প্রমাণের প্রকৃত বিষয় বলে স্বীকার করেছে।

জৈন দর্শনে প্রমাণের বিষয় হিসেবে কোনো পদার্থকে কেবল সাধারণ (সামান্য) বা কেবল বিশেষ (বিশেষ) বলে গ্রহণ করা হয় না; বরং প্রত্যেক পদার্থই সাধারণ ও বিশেষ উভয় ধর্মের সমন্বয়ে গঠিত একটি অনেকান্তাত্মক বাস্তবতা। এই সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে বলা হয়েছে— "अनुवृत्तव्यावृत्तप्रतीतिविषयत्वात् पूर्वोत्तराकारहानोपादानावस्थानलक्षणपरिणत्यार्थ-क्रियाकारित्वाच्च।"[৪০] অর্থাৎ, প্রত্যেক পদার্থ এমন এক সত্তা যা একদিকে অনুবৃত্তি (সাদৃশ্য বা সাধারণতা)-র জ্ঞানের বিষয় এবং অন্যদিকে ব্যাবৃত্তি (পার্থক্য বা বিশেষতা)-র জ্ঞানের বিষয়। উদাহরণস্বরূপ, বহু গরুর মধ্যে "এটিও গরু", "ওটিও গরু"— এই ধরনের অভিন্নতার জ্ঞান যে ধর্মের কারণে হয়, তাকে সাধারণ বা সামান্য বলা হয়। আবার "এটি কালো গরু", "ওটি সাদা গরু"— এই ধরনের ভিন্নতার জ্ঞান যে ধর্মের মাধ্যমে হয়, তাকে বিশেষ বলা হয়। তদুপরি, প্রত্যেক পদার্থে পূর্বাবস্থার বিলোপ, নতুন অবস্থার উৎপত্তি এবং মূল সত্তার স্থায়িত্ব একসঙ্গে লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ, পদার্থে উৎপাদ (উদ্ভব), ব্যয় (বিনাশ) এবং ধ্রৌব্য (স্থিতি)— এই তিনটি বৈশিষ্ট্য একত্রে বিদ্যমান। এই কারণেই কোনো পদার্থকে কেবল নিত্য বা কেবল অনিত্য বলা যায় না; বরং তা সাধারণ ও বিশেষ উভয় ধর্মবিশিষ্ট। জৈন অনেকান্তবাদ এই সমন্বিত বাস্তবতাকেই প্রমাণের প্রকৃত বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছে।

---

৩৭. তদেব, পৃ. ৪২ ।

৩৮. মহারাজ, কন্হৈয়ালাল জী। *ন্যায়রত্নসার*। ইন্দোর: আচার্য শ্রী ঘাসীলাল জী মহারাজ, ১৯৮৯, পৃ. ১১৫ থেকে উদ্ধৃত।

৩৯. মহারাজ, কন্হৈয়ালাল জী। *ন্যায়রত্নসার*। ইন্দোর: আচার্য শ্রী ঘাসীলাল জী মহারাজ, ১৯৮৯, পৃ. ১১৭ থেকে উদ্ধৃত।

৪০. তদেব, পৃ. ৪৩ থেকে উদ্ধৃত।

সামান্য বা সাধারণ ধর্মের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে বলা হয়েছে— "सामान्यं द्विविधं तिर्यगूर्ध्वतासामान्यभेदात्।"[৪১] অর্থাৎ, সামান্য দুই প্রকার— তির্যক্‌সামান্য এবং ঊর্ধ্বতাসামান্য। এর মধ্যে "सदृशपरिणामरूपं तिर्यक्सामान्यम्।"[৪২] সূত্র অনুসারে তির্যক্‌সামান্য হলো সেই সাধারণ ধর্ম, যা একই সময়ে বহু ব্যক্তির মধ্যে সমভাবে বর্তমান থাকে; যেমন বিভিন্ন গরুর মধ্যে বিদ্যমান 'গোত্ব' বা গরুত্বধর্ম। অপরদিকে "पूर्वापरविवर्तव्याप्यूर्ध्वतासामान्यम्।"[৪৩] সূত্রে ঊর্ধ্বতাসামান্যকে এমন একটি সাধারণ ধর্ম বলা হয়েছে, যা কোনো পদার্থের পূর্ব ও পরবর্তী সকল পর্যায়ে অবিচ্ছিন্নভাবে বিরাজ করে; যেমন মাটির পিণ্ড, কপাল, ঘট ইত্যাদি বিভিন্ন রূপান্তরের মধ্যেও মৃৎদ্রব্যের মৌলিক সত্তা অটুট থাকে। এরপর বিশেষের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে বলা হয়েছে— "गुणपर्यायभेदाद्विशेषोऽपि द्विविध:।" অর্থাৎ বিশেষও দুই প্রকার— গুণবিশেষ এবং পর্যায়বিশেষ। এই দুইয়ের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে— "अभिन्नकालवर्तिन: सुखज्ञानादयो गुणा:। भिन्नकालवर्तिनश्च सुखदु:खादय: पर्याया:।।"[৪৪] অর্থাৎ, যে বিশেষধর্মগুলি একই সময়ে কোনো দ্রব্যে সহাবস্থান করতে পারে, যেমন জ্ঞান, দর্শন, সুখ ইত্যাদি, সেগুলি গুণ; আর যে বিশেষধর্মগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়, যেমন সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বিষাদ প্রভৃতি পরিবর্তনশীল অবস্থা, সেগুলি পর্যায়। অতএব, জৈন দর্শন অনুসারে প্রতিটি পদার্থ সাধারণ ও বিশেষ, গুণ ও পর্যায়, নিত্যতা ও পরিবর্তন— এই সমস্ত ধর্মের সমন্বয়ে গঠিত এক বহুমাত্রিক বাস্তবতা, এবং এই সমন্বিত স্বরূপকেই যথার্থ জ্ঞানের বিষয় হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

উপসংহার: জৈন দর্শনে আগম পরোক্ষ প্রমাণের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকার। আগম শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো— "आसमन्ताद् गम्यते बोध्यते ज्ञायते आत्मतत्त्वं येनासावागम:।"[৪৫] অর্থাৎ যার মাধ্যমে আত্মতত্ত্ব বা বাস্তব সত্যকে সম্যকভাবে জানা ও উপলব্ধি করা যায়, তাকে আগম বলা হয়। জৈন আচার্যগণ আগমকে "आप्तवचनात् जातं श्रुतज्ञानमागम:।"[৪৬] এইভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন; অর্থাৎ আপ্ত বা নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির বচন থেকে যে শ্রুতজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাই আগম। প্রকৃত অর্থে আগম হলো সেই জ্ঞান, কিন্তু যেহেতু আপ্তবচন সেই জ্ঞানের কারণ, তাই গৌণ অর্থে আপ্তবচনকেও আগম বলা হয়। আগম মূলত শ্রুতজ্ঞান, যা দুই প্রকার—দ্রব্যশ্রুত ও ভাবশ্রুত। বর্ণ, পদ ও বাক্যরূপ যে পুদ্গলধর্মী শব্দসমষ্টি, তা দ্রব্যশ্রুত; আর সেই শব্দ থেকে উৎপন্ন অর্থজ্ঞানই ভাবশ্রুত। জৈন জ্ঞানতত্ত্বে আগমকে শব্দাত্মক অর্থবোধের প্রধান মাধ্যম এবং শ্রুতজ্ঞানের একমাত্র ভেদ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

শব্দের মাধ্যমে অর্থবোধ কীভাবে সম্ভব হয়, সে বিষয়ে জৈন দার্শনিকরা বলেন যে শব্দ যোগ্যতা এবং সংকেত— এই দুই উপাদানের সাহায্যে অর্থ প্রকাশ করে। প্রত্যেক শব্দের মধ্যে একটি স্বাভাবিক অর্থবোধক শক্তি নিহিত থাকে, যার ফলে নির্দিষ্ট শব্দ থেকে নির্দিষ্ট অর্থেরই জ্ঞান জন্মায়— "स्वाभाविकसामर्थ्यसमयाभ्यामर्थबोधनिबन्धनं शब्द:।"[৪৭] (প্রমাণনয় ৪/১১) তবে এই শক্তি সম্পর্কে জ্ঞান না

---

৪১. তদেব, পৃ. ৪৪ থেকে উদ্ধৃত।

৪২. মহারাজ, কহ্নৈয়ালাল জী। *ন্যায়রত্নসার*। ইন্দোর: আচার্য শ্রী ঘাসীলাল জী মহারাজ, ১৯৮৯, পৃ. ১২০ থেকে উদ্ধৃত।

৪৩. তদেব, পৃ. ১২১ থেকে উদ্ধৃত।

৪৪. মহারাজ, কহ্নৈয়ালাল জী। *ন্যায়রত্নসার*। ইন্দোর: আচার্য শ্রী ঘাসীলাল জী মহারাজ, ১৯৮৯, পৃ. ১২২ থেকে উদ্ধৃত।

৪৫. মিশ্র, বিশ্বনাথ। *জৈনন্যায়পঞ্চশতী*। রাজস্থান: জৈন বিশ্বভারতী সংস্থান, ২০১২, পৃ. ৪৪ থেকে উদ্ধৃত।

৪৬. মিশ্র, বিশ্বনাথ। *জৈনন্যায়পঞ্চশতী*। রাজস্থান: জৈন বিশ্বভারতী সংস্থান, ২০১২, পৃ. ৪৪ থেকে উদ্ধৃত।

৪৭. ন্যায়াচার্য, শ্রীসতীন্দ্রচন্দ্র। *জৈনদর্শনের দিগ্‌দর্শন*। কলকাতা: সংস্কৃত কলেজ, ১৯৭৫, পৃ. ৩ থেকে উদ্ধৃত।

থাকলে বা তা বিস্মৃত হলে শব্দ শুনেও অর্থবোধ হয় না। যেমন ইন্দ্রিয়সমূহ স্বভাবতই নিজ নিজ বিষয়কে প্রকাশ করে, তেমনি শব্দও তার অন্তর্নিহিত শক্তির দ্বারা অর্থ প্রকাশ করে। পাশাপাশি সামাজিক ও ভাষাগত সংকেতও অর্থবোধে সহায়তা করে; অর্থাৎ কোন শব্দ দ্বারা কোন অর্থ বোঝানো হবে, তা প্রচলিত রীতি বা সংকেতের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। এই শব্দশক্তির জ্ঞান ব্যাকরণ, উপমান, অভিধান, আপ্তবাক্য ও ব্যবহার থেকে অর্জিত হয়। অতএব, জৈন দর্শনে আগম কেবল আপ্তবাক্য নয়, বরং শব্দশক্তি ও অর্থবোধের একটি সুসংহত জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া, যা মানুষের পরোক্ষ জ্ঞানের একটি নির্ভরযোগ্য উৎস হিসেবে স্বীকৃত।

জৈন আগমে বর্ণিত স্যাদ্বাদ তত্ত্ব কেবল তাত্ত্বিক জ্ঞানচর্চার বিষয় নয়। এর বাস্তব প্রয়োগ পারিবারিক ও সামাজিক জীবনেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিবারে পিতা-পুত্র, শাশুড়ি-বউমা কিংবা অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে যে মতভেদ ও সংঘাত দেখা যায়, তার মূল কারণ হলো দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য। যেমন — পিতা যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে বড় হয়েছেন, সেই অভিজ্ঞতা ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে তিনি পুত্রের জীবন গড়ে তুলতে চান। অন্যদিকে পুত্র আধুনিক চিন্তা, যুক্তিবাদ এবং সমসাময়িক মূল্যবোধ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিজের জীবন পরিচালনা করতে চায়। একইভাবে শাশুড়ি আশা করেন যে বউমা তাঁর মতোই সংসারজীবন পরিচালনা করবে, কিন্তু বউমা নিজের সময়, শিক্ষা ও পারিবারিক সংস্কারের আলোকে স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করতে চায়। এই ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যাশা থেকেই অধিকাংশ পারিবারিক সংঘাতের সূচনা হয়। স্যাদ্বাদ শিক্ষা দেয় যে কোনো বিষয়কে একমাত্র নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার না করে অন্যের অবস্থান থেকেও বিবেচনা করা উচিত। প্রত্যেক মতের মধ্যে আংশিক সত্য নিহিত থাকতে পারে— এই উপলব্ধি মানুষকে সহিষ্ণু, উদার এবং পরমতসহিষ্ণু করে তোলে। ফলে একপাক্ষিকতা ও অহংকেন্দ্রিক মনোভাব দূর হয়, পারস্পরিক বোঝাপড়া বৃদ্ধি পায় এবং পরিবারে শান্তি, সমন্বয় ও সৌহার্দ্যের পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবেই জৈন আগমপ্রমাণে প্রতিপাদিত স্যাদ্বাদ মানবজীবনে অহিংসা, সহাবস্থান ও সম্প্রীতির এক কার্যকর আদর্শ হিসেবে প্রতিফলিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. জৈন, ড. জগদীশচন্দ্র। *স্যাদ্বাদমঞ্জরী (মল্লিসেন)*। গুজরাত: শ্রী রাবজী ভাই দেশাই, ১৯৭০।
২. জৈন, সাগরমল ও যাদব, ভিখারীরাম। *স্যাদ্বাদ ঔর সপ্তভঙ্গীনয়*। বারাণসী: পার্শনাথ বিদ্যাশ্রম শোধ সংস্থান, ১৯৮৯।
৩. জৈন, শ্রী হীরালাল। *প্রমেয়রত্নমালা*। বারাণসী: চৌখম্বা বিদ্যাভবন, ১৯৬৪।
৪. ন্যায়াচার্য, শ্রীসতীন্দ্রচন্দ্র। *জৈনদর্শনের দিগ্‌দর্শন*। কলকাতা: সংস্কৃত কলেজ, ১৯৭৫।
৫. ভট্টাচার্য, অমিত। *জৈনদর্শন*। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১১।
৬. মহারাজ, কন্হৈয়ালাল জী। *ন্যায়রত্নসার*। ইন্দোর: আচার্য শ্রী ঘাসীলাল জী মহারাজ, ১৯৮৯।
৭. মিশ্র, বিশ্বনাথ। *জৈনন্যায়পঞ্চশতী*। রাজস্থান: জৈন বিশ্বভারতী সংস্থান, ২০১২।
৮. সরকার, তমোঘ্ন। *জৈনজ্ঞানতত্ত্ব ও তর্কপরিভাষা*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০২১।
৯. সংঘবী, সুখলাল। *তত্ত্বার্থসূত্র*। বারাণসী: পার্শনাথ বিদ্যাপীঠ, ২০০৯।
10. Mehta, Mohan lal. *Outlines of Jaina Philosophy.* Bangalore: Jain Mission Society, 1954.
11. Tatia, Nathmal. *Studies in Jaina Philosophy.* Banaras: Jain Culture Research Society, 1951.
12. Kapadia, Hiralal Rasikdas. *Anekartha-Ratna-Manjusa.* Surat: Jivanchand Sakerchand Javeri, 1933.